কালের কণ্ঠ

তারিখ · 05 DEC 2016 ……
পৃষ্ঠা ……১৪…… কলাম …… ৬ ……

মাছুম বিল্লাহ ▷

এনসিটিবির পাঠ্য বই কেন বিক্রি হবে কেজি দরে

সরকার দিতে চাইলে শুধু প্রাথমিকের জন্য আকর্ষণীয় বই তৈরি করে বিনা মূল্যে বিতরণ করতে পারে, মাধ্যমিকের জন্য বিনা মূল্যে বই বিতরণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না সরকার আবারও তা ভেবে দেখতে পারে। এখন সরকার এই সিদ্ধান্ত থেকে অর্থাৎ বিনা মূল্যে বই বিতরণ থেকে সরে আসতে পারবে কি না জানি না। কারণ একবার দিয়ে তা বন্ধ করা রাজনৈতিকভাবে তারা কতটা কিভাবে নেবে—সেটিও দেখার বিষয়। তবে আমরা মনে করি, বই থাকতে হবে উন্মুক্ত, সবার জন্য, সর্বত্র—সব সময় সহজলভ্য

আমরা এমন অনেক কাজ করি যেগুলোর চেয়ে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে থাকে, সেগুলোর দিকে আমরা ফিরেও তাকাই না। কেউ বলতে গেলেও অন্যভাবে নিই। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা, সভা-সেমিনার হচ্ছে। শিক্ষার মান বাড়া বা শিক্ষার্থীদের যে অতিরিক্ত কিছু স্কিল অর্জিত হচ্ছে সেটি কিন্তু আমাদের কারিকুলাম, বই, কিংবা মূল্যায়ন পদ্ধতির জন্য নয়। এটি হয়েছে বিশ্বায়ন ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে।

শিক্ষার মানের দিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার ছিল প্রথমেই। কারণ আমরা আর ১৯৭২-৭৩ সালের মতো অবস্থায় নেই। বিভিন্ন সূচকে দেশ এগিয়েছে অনেক, কাজেই শিক্ষার গুণগত মানের দিকে, গবেষণার দিকে, বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শেখানো পরিবেশ উন্নত করার দিকে প্রচুর নজর দেওয়া প্রয়োজন। বইয়ের অভাবে পড়তে পারবে না বা বই না হলে স্কুলে যাবে না, সে রকম বাচ্চার সংখ্যা, অভিভাবকের সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে। তার পরও যেসব এলাকায় ছেলেমেয়েরা বই কিনতে পারে না, সরকারি বিনা মূল্যের বই দরকার ছিল শুধু তাদের জন্য। কিন্তু আমরা কী করেছি? সবার জন্য বিনা মূল্যে বই বিতরণ শুরু করেছি। এনসিটিবির একটি বইয়ের মূল্য সর্বোচ্চ ১৯.৮৫ টাকা। সেই হিসাবে প্রাথমিকের একজন শিক্ষার্থীর ৮০ থেকে ৯০ টাকা আর মাধ্যমিকের ১৫০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে বই কেনা শেষ। এই বই দিয়ে তো আমরা শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট কোচিং বন্ধ করতে পারছি না। প্রাইভেট কোচিংয়ের পেছনে একজন শিক্ষার্থীকে প্রতি মাসে ব্যয় করতে হয় কয়েক হাজার টাকা। সরকারের বা মন্ত্রণালয়ের ভাবনা হয়তো এটি ছিল যে নতুন বইয়ের গন্ধে, আনন্দে ও টানে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে বেশি বেশি আসবে। এটি সরকারের একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ।

আমাদের অফিসের এক কর্মী এসেছিলেন আমার কাছে তাঁর ষষ্ঠ শ্রেণির ছেলের জন্য বাংলা ও ইংরেজি বই দুটি আমি দিতে পারব কি না তা জানতে। তাঁর ছেলে দুটি বই-ই ছিঁড়ে ফেলেছে। তাঁর ছেলে কেন, অনেক বাচ্চাই নিউজপ্রিন্টের বই ছিঁড়ে ফেলে। দ্বিতীয়বার তারা সে বই কোথায় পাবে? খুঁজে দেখলাম, বই আমার কাছে নেই। পরের দিন এলেন হাতে কিছু কাগজ নিয়ে। যাতে আমি ওয়েবসাইট থেকে বইগুলো ডাউনলোড করে তাঁকে প্রিন্ট করে দিতে পারি। অনেক চেষ্টা করলাম, আমার অন্য এক সহকর্মীও চেষ্টা করলেন; কিন্তু এনসিটিবির ওয়েবসাইটে বই নেই।

বই তো শুধু শিক্ষার্থীরাই পড়ে না। বই পড়তে হয় শিক্ষকদের, অভিভাবকদের, গবেষকদের এবং শিক্ষা নিয়ে যাঁরা চিন্তাভাবনা করেন তাঁদের সবাইকে। তাঁরা বই পাবেন কিভাবে? উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কিংবা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে চাহিদা দিতে হবে অনেক আগে। তার আবার যুক্তি থাকতে হবে? কারণ বই তো বরাদ্দ শিক্ষার্থীদের জন্য। আমি নিজে বইয়ের জন্য অনেকবার এনসিটিবিতে গিয়েছি, বই পাইনি। বইয়ের ক্ষেত্রে এত রেশনিং খুব ভালো ইঙ্গিত বহন করে না। ফলে বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে পরিচিত শিক্ষকদের কাছ থেকে বই নিয়েছি।

সম্প্রতি পত্রিকায় দেখলাম, মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৩০ লাখ পাঠ্য বই কেজি দরে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রণালয়। বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য এসব বই তিন বছর ধরে ভুল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ছাপানো হয়েছে। উদ্বৃত্ত বই ছাপাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে প্রায় ছয় কোটি টাকা। কেজির হিসাবে বিক্রি করলে পাওয়া যাবে সাড়ে ৩৩ লাখ টাকা। সেই হিসাবে সরকারের গচ্ছা যাচ্ছে পাঁচ কোটি সাড়ে ৬৬ লাখ টাকা। ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে মোট ৩০ লাখ বই উদ্বৃত্ত হয়। দুই দফা বৈঠকের পর গত ২৭ অক্টোবর বই বিক্রির সিদ্ধান্ত দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০১৬ ও ২০১৭ সালেও ভুল হিসাবে বই ছাপা হয়েছে। এ দুই বছরের বাড়তি বই শিক্ষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এর পরও অবশিষ্ট থাকলে তা স্কুল ও স্থানীয় পর্যায়ে পাঠাগারে দেওয়া হবে।

বেশি বই কেন ও কিভাবে ছাপা হলো? এক, এনসিটিবিকে দেওয়ার জন্য স্কুল থেকে শুরু করে মাউশি পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই বইয়ের বাড়তি চাহিদা তৈরি করা হয়। কারণ কোনো স্কুলই তো সঠিক হিসাব জানে না যে তার স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে নতুন কয়জন শিক্ষার্থী ভর্তি হবে, নবম শ্রেণিতে কয়জন কোন বিভাগে পড়বে এবং নতুন ভর্তি হবে। এসব কারণেই স্কুলে থেকে আনুমানিক একটি হিসাব দেওয়া হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবের সঙ্গে মিলে না। দুই, বিকল্প বিষয়ে বইয়ের সঠিক পরিসংখ্যান নিরূপণে ব্যর্থতা। উপজেলা-জেলা শিক্ষা অফিসের সঙ্গে মাউশির সমন্বয়হীনতা ও দায়িত্বপ্রাপ্তদের দায়িত্বহীনতা। যাদের বই দরকার তারা বই পায় না, আবার অতিরিক্ত বই কয়েক বছর ধরে পড়ে আছে। এই বৈপরীত্য এ পরিস্থিতিতে তৈরি হওয়াটা খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আঞ্চলিক পরিচালকদের দেওয়া এ তথ্যের সঙ্গে একমত নয় মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবি।

ভবিষ্যতে যাতে অতিরিক্ত বইয়ের চাহিদা না আসে সে লক্ষ্যে মাউশিতে একটি সেল গঠন ও মাঠপর্যায়ে ৫৫৯টি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। মাঠপর্যায়ের এসব কমিটির মধ্যে ৬৪টি জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (শিক্ষা) নেতৃত্বে কাজ করবে। বাকি কমিটিগুলো হবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে। কমিটি যাচাই-বাছাই শেষে বইয়ের চাহিদা দেবে। তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সেল পাঠাবে এনসিটিবিতে। এ প্রক্রিয়ায় ২০১৮ সালে সঠিক হিসাবে বই ছাপানো হবে বলে জানা যায়। এর অর্থ হচ্ছে, বইকে আরো বেশি মাত্রায় 'রেশনিং'-এর আওতায় নিয়ে আসা। যাদের বই পাওয়া দরকার তারা বই পাবে না। যখন পাওয়া দরকার তখন পাবে না। আর সরকারি দীর্ঘসূত্রতার কথা তো সবারই জানা।

বই আসলে সবার জন্য বিনা মূল্যে প্রয়োজন নেই। বস্তি এলাকার জন্য বিনা মূল্যে বই বিতরণ করা যেতে পারে আর দুর্গম এলাকা, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা মূল্যে বই বিতরণ করা যেতে পারে। বাকি অর্থ দিয়ে শিক্ষার মান ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করার দিকে নজর দিলে দেশ বেশি উপকৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। উন্নতমানের বই, পৃষ্ঠা, ছবি, যার ছাপা মূল্য বেশি পড়বে, এ ক্ষেত্রে সরকার সাবসিডি দিতে পারে, যেটি আগে হতো। তার পরও সরকার দিতে চাইলে শুধু প্রাথমিকের জন্য আকর্ষণীয় বই তৈরি করে বিনা মূল্যে বিতরণ করতে পারে, মাধ্যমিকের জন্য বিনা মূল্যে বই বিতরণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না সরকার আবারও তা ভেবে দেখতে পারে। এখন সরকার এই সিদ্ধান্ত থেকে অর্থাৎ বিনা মূল্যে বই বিতরণ থেকে সরে আসতে পারবে কি না জানি না। কারণ একবার দিয়ে তা বন্ধ করা রাজনৈতিকভাবে তারা কতটা কিভাবে নেবে—সেটিও দেখার বিষয়। তবে আমরা মনে করি, বই থাকতে হবে উন্মুক্ত, সবার জন্য, সর্বত্র—সব সময় সহজলভ্য; কিন্তু বই হতে হবে মানসম্পন্ন, বইয়ের বিষয়, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ হতে হবে আকর্ষণীয় ও প্রকৃত শিক্ষার্থীবন্ধাব।

লেখক : ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত
সাবেক ক্যাডেট কলেজ শিক্ষক
masumbillah65@gmail.com